দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05 AUG 1997
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৭

ফ্রী স্টাইলে দুর্নীতি ॥ পেনশন ফরম প্রকাশ্যে বিক্রি

এজি অফিস ॥ টাকার জন্য 'হা' করে থাকে চেয়ার টেবিল

মাহমুদ হাফিজ

রাজধানীর 'এজি' অফিসে ঘুষ-দুর্নীতি আগের মতো ফ্রী স্টাইলে চলছে ঘুষ না দিলে 'এজি'র ফাইল নড়ে না। এ অফিসের টেবিল-চেয়ার পর্যন্ত টাকার জন্য 'হা' করে থাকে। দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রোজকার মুখ্য আলোচ্য কে কোন্ 'কেসে' কত পেয়েছে। 'এজি' অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে প্রতিটি ফাইলই একটি লোভনীয় 'কেস'। টাকা ছাড়া 'কেসের নিষ্পত্তি হচ্ছে না। এজির সর্বগ্রাসী ঘুষ প্রবণতা জন্ম দিয়েছে হয়রানির। এ অফিসের দ্বারস্থ হয়ে হয়রানি পেরেশানির শিকার হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। হয়রানির

বিড়ম্বনা প্রতিপদে

অসহায় শিকারে সবচেয়ে বেশি পর্যুদস্ত হচ্ছেন পেনশন গ্রহণেচ্ছু অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারি। গতকাল সোমবার সরেজমিন পরিদর্শনকালে এসব তথ্যের প্রমাণ মিলেছে।

সেগুনবাগিচা এজি অফিস বর্তমানে 'সিজিএ' (কন্ট্রোলার জেনারেল অব একাউন্টস)-এর অফিস। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও হিসাবরক্ষণে এ অফিস নিয়োজিত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বলেই বাড়তি অর্থ ছাড়া এজিতে কাজ হয় না। স্বয়ং এজির কর্মকর্তারাও অবসরের পর ঘুষ ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

সরকারী চাকরির বেতন-ভাতা সংক্রান্ত যে কোন ধরনের ঝামেলা নিষ্পত্তির জন্য এজিতে দৌড়াতে হয়। 'পেনশন' পেতে হলে বাইরের সব 'ঘাট' পেরিয়েও এজি অফিসের 'বারো ঘাট' পেরুতে হয়। পেনশনভোগী, পেনশনেচ্ছু এবং চাকরির জটিলতা ছোটাতে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ এজিতে আসছেন। পাঁচতলা-একতলা

কাকরাইলস্থ হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় —জনকণ্ঠ

করতে করতে অবসর জীবনে অনেকের জীবনপ্রদীপ নিভু নিভু। বিশেষ করে পেনশন পাওয়ার প্রক্রিয়া এত জটিল ও দীর্ঘসূত্রী যে, পেনশনেচ্ছু সব কর্মকর্তা-কর্মচারীই অবর্ণনীয় হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন। কারও কারও বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে পেনশন প্রক্রিয়ায়। ভুক্তভোগী অনেকের কাছ থেকে এ অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল সোমবার এজিতে দেখা হলো জোয়ারদার আবদুর রশীদের সঙ্গে। তিনি স্বাস্থ্য-ধর্ম মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পদ থেকে তিনি অবসর পূর্ব ছুটিতে যান। ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছেন। আলাপ করে জানা গেল, পেনশন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেননি এখনও। কাগজপত্র সংগ্রহ করছেন এখনও। এজি অফিস থেকে দু'টি মূল কাগজ এখনও পাননি। এসেছিলেন পেনশন সংক্রান্ত খোঁজখবর নিতে। এজির অফিসের হয়রানি-ঘুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জানান, মানুষের নৈতিক পদস্খলন ও চাহিদার কারণে এ ধরনের দুর্নীতি বাড়ছে। এজির কর্মচারীদের ঘুষ প্রবণতা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে জানিয়ে বললেন ঃ যারা মানুষকে হয়রানি করে, তারাও হয়রানিতে পড়ে।

জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর সহকারী পরিচালক মোঃ নূরুল ইসলাম চার মাসের মাথায় পেনশন মঞ্জুরি ও তা এজি অফিসের অনুমোদন করাতে সক্ষম হয়েছেন। তবে টাকা পেতে তাঁর এখনও অনেক দেরি।

পেনশন তোলার জটিল ও হয়রানিমূলক পদ্ধতির স্বয়ং শিকার হচ্ছেন এজির কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও। এ রকম একজন হচ্ছেন এজির অবসরপ্রাপ্ত অডিটর এম. এ. রশীদ। দীর্ঘদিন এজির কর্মচারী এ্যাসোসিয়েশনের প্রভাবশালী নেতাও ছিলেন তিনি। জটিল ও হয়রানিমূলক পদ্ধতির কবলে পড়ে তিনি পেনশন পাওয়ার প্রতীক্ষা করছেন। এজির চাহিদা অনুযায়ী রাজ্যের কাগজপত্র যোগাড় করতে তাঁকেও হতে হয়েছে গলদঘর্ম। কাগজপত্র জমা দিয়েছেন।

এজি অফিসের একজন 'প্রধান হিসাবেরক্ষণ কর্মকর্তা' তাঁর অফিসের হয়রানির কথা নাকচ করে বললেন, প্রতিটি কেসের ফাইল কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছে কতদিন থাকবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। ফলে সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে ১৫ দিনেই কাজ শেষ করে দেয়া যায়। তিনি বলেন, পেনশন পদ্ধতিটিই জটিল। তা ছাড়া পেনশনভুক্ত অবসর নেয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সব কাগজসহ দরখাস্ত করতেই দু'এক বছর কাটিয়ে দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপিত হলে পেনশন প্রাপ্তি দীর্ঘসূত্রী হয়ে পড়ে। তিনি স্বীকার করেন, সচিবসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকেই পেনশন প্রক্রিয়ায় বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

খোঁজ নিয়ে পেনশন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা গেছে চমকপ্রদ সব তথ্য। অবসর নেয়ার পর একজন কর্মচারীকে প্রথমেই পেনশনের জন্য দৌড়াতে হয় এজি অফিসে। প্রথম কাজ তিন কপি 'পেনশন ফরম' সংগ্রহ করা। এ ফরম বিনামূল্যে রেকর্ড রুমে পাওয়ার কথা। তবে সেখানে তা পাওয়া যায় না। এই ফরম ৪ টাকা করে প্রকাশ্যে বিক্রি হয় এজি অফিসের বাইরে। এই ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট অফিসের অবসর গ্রহণের গেজেট পেনশন মঞ্জুরি পত্র, 'নো ডিমান্ড' সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চরিত্র সনদ, তিন কপি ছবি এবং এজি থেকে সংগ্রহ করা সার্ভিস স্টেটমেন্ট ও লাস্ট পেমেন্ট সার্টিফিকেট (পিএলসি)সহ জমা দিতে হয়। সংশ্লিষ্ট অফিসের মাধ্যমে তা এজিতে আসে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এজি অফিসের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কাছে এ ফাইল আসে। তিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাছে ফাইল পাঠান। সেখান থেকে ফাইল যায় সুপারিন্টেন্ডেন্টসের কাছে। তিনি একজন 'অডিটর'-কে ফাইলটি ডিল করার কাজে নিয়োজিত করেন। 'অডিটর' ফাইলটিতে আপত্তি দিলে হয়রানির অন্ত থাকে না। আপত্তি না থাকলে একইভাবে অনুমোদন হতে হতে ওপরে আসে। অনুমোদনের পর একটি অর্ডার হয়, যার নাম 'পিপিও'। পেনশন পেমেন্ট অর্ডার। 'পিপিও'-এর প্রেক্ষিতে হিসাবপত্র করে একটি বিল ইস্যু করা হয়। বিলে প্রাপ্ত এককালীন গ্রাচ্যুইটির টাকার ওপর চেক ইস্যু করা হয় ক্যাশ সেকশন থেকে। মাসিক পেনশনের টাকা প্রাপকের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

এটি হলো বিদ্যমান নিয়ম। তবে এই নিয়মের অধীনেই ঘাটে ঘাটে টাকা ঢালতে হয় পেনশনেচ্ছুকে। বিনা কারণেও টাকা আদায়ের জন্য এজির দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীরা অজুহাত তুলে পেনশন গ্রাহককে হয়রানি করে।

পেনশনভোগীদের সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের ৮০ ভাগ পেনশন হিসাবে দেয়া হয়। এর অর্ধেকটা মাসিক কিস্তিতে দেয়া হয়। মূল বেতনের ৮০ শতাংশের বাকি অর্ধেককে টাকা প্রতি দু'শ' টাকা হিসাবে গুণ করে এককালীন প্রদান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ কোন কর্মকর্তার সর্বশেষ মূল বেতন ৫ হাজার টাকা হলে এর ৮০ শতাংশ হচ্ছে ৪ হাজার টাকা। এ ক্ষেত্রে তিনি মাসিক পেনশন পাবেন দু'হাজার টাকা। এককালীন পাবেন ৪ লাখ টাকা।

এজি অফিসের বিভিন্ন সূত্র জানায় পেনশন 'কেস'গুলো হচ্ছে লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। ফলে পেনশন গ্রাহকরা এজি অফিসের সংশ্লিষ্ট সকলকেই 'খুশি' করেন। খুশি করার অঙ্ক পাঁচ শ' থেকে বিশ হাজার টাকা হলেও এ টাকা এজির লোকেরা 'চা-পানি' খাওয়ার পয়সা নামে অভিহিত করেছে।